বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয় – বাংলা সাহিত্য
শ্রেণি – স্নাতকোত্তর (পি.জি.)
পাঠ পর্যায় – ২-য় (Semester – II)
কোর্স নং – BNG-202
ইউনিট – II
শিক্ষক – প্রফেসর ড. তুষার কোনার

'বনলতা সেন' ও জীবনানন্দ দাশ

(জন্ম – ১৮৯৯; মৃত্যু – ২২ অক্টো., ১৯৫৪)

দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তীকালে বাংলা কাব্য জগতে জীবনানন্দের আবির্ভাব। তখন বিশ্ব আন্দোলিত হচ্ছে বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ফল স্বরূপ দারিদ্র্য, বেকারত্ব, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, হানাহানি তথা সার্বিক অনিশ্চয়তা আর অস্থিরতায়। পূর্ববর্তী যুগের সামাজিক সুস্থিতি, সত্য-শিব-সুন্দরের বীণ বিচ্ছিন্ন। স্বভাবতই ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র এবং অধ্যাপক জীবনানন্দ দাশ তাঁর সাহিত্যের (কবিতা এবং কথা) পটভূমি করলেন এই অস্থির, অনিশ্চিত সময়কে। কেননা তখন পাশ্চাত্যের সাহিত্যও আন্দোলিত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী এই বিক্ষুব্ধ সময় চেতনার দ্বারা। স্বভাবতই নিজের চতুর্পার্শ্ব এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতা তাঁকে অনুপ্রাণিত করলো বাংলা সাহিত্যের এতদিনকার রবীন্দ্রকেন্দ্রিক আচ্ছাদিত কবিতা কুঞ্জিত কাননে ভিন্নতর এক কণ্ঠস্বরের প্রবর্তনায়—

'কেউ যাহা জানে নাই – কোনো এক বাণী – / আমি বহে আনি; / একদিন শুনেছ যে সুর – / ফুরায়েছে – পুরানো তা কোনো এক নতুন কিছুর / আছে প্রয়োজন / তাই আমি আসিয়াছি, – আমার মতন / আর নাই কেহ।

/.../ সকলের পায়ের শব্দের / সুর গেছে অন্ধকারে থেমে ;/ তারপর আসিয়াছি নেমে আমি / আমার পায়ের শব্দ শোনো'—/ নতুন এ – আর সব হারানো-পুরানো।' (কয়েকটি লাইন / জীবনানন্দ দাশ)

বস্তুত, পাশ্চাত্যে সাহিত্যের পূর্বে চিত্রকলায় দেখা গিয়েছিল পরিবর্তমান সময়ের ঢেউ। মানুষের যাবতীয় আচরণের পেছনে নিহিত থাকে তার মনের ত্রিবিধ স্তরের (ইদ - ইগো - সুপারইগো) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া – মনোচিকিৎসক ~~[illegible]~~ সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের এই সিদ্ধান্ত জন্ম দিল সুররিয়ালিজম (পরাবাস্তববাদ)-এর; সেই সূত্রে স্ট্রীম অফ কনসাসনেস (চেতনা প্রবাহ) এবং ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁর ও সাথে মেকানিক্যাল ও সাইকোলো-জিক্যাল সময় বিভাজনের বীজমন্ত্র। ইতিমধ্যে ক্যামেরার আবিষ্কার, পাশ্চাত্যের চিত্রশিল্পীদের চিত্রের বীজমন্ত্র আনল পরিবর্তন। যেমন তখন প্রকৃতির হুবহু অনুকরণে আর কোন কৃতিত্ব নেই বলে শিল্পীরা অনুভব করলেন। বাস্তবিক ক্যামেরার ছবির সমকক্ষ তাঁদের হাতে আঁকা ছবি কখনোই হয়ে উঠবে না – এর প্রভাব তাঁদের পসারেও পড়ছিল অবধারিত রূপে। ফলে চিত্রশিল্পীরা তাঁদের শিল্পে অভিনবত্ব আনার প্রয়োজন বোধ করলেন। আর সেই তাগিদেই চিত্রশিল্পের বীজ জন্ম দিল সিম্বলিজম (প্রতীকবাদ), এক্সপ্রেশনইজম (প্রকাশবাদ), ইম্প্রেশনইজম, ~~[illegible]~~ ইমেজইজম (চিত্রকল্পবাদ), কিউবিজম – এর মতো জনার (genre)। অন্যদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে অন্যতম প্রশ্ন: 'মানুষের অস্তিত্ব হলো সবচেয়ে সঙ্কটাপূর্ণ, অস্তিত্বহীন, সংস্কৃতি থেকে বুদ্ধিভিত্তিক। ~~[illegible]~~ মানবসত্তার এই অবস্থাই জন্ম দিল, ~~[illegible]~~ এক্সিস্টেনশিয়ালিজম (অস্তিত্ববাদ), রিয়ালিজম (বাস্তববাদ), সোসাল-রিয়ালিজম (সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ), অ্যাবসার্ডইজম- এর মতো দর্শনভিত্তিক মতবাদী আন্দোলনের। বলাবাহুল্য এই সবের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিল জীবনানন্দের কাব্য জগৎ। তাই জীবনানন্দকে সামগ্রিক ভাবে অনুধাবন না করে যাঁরা তাঁর কাব্যজগৎ এবং কবি প্রতিভাকে খণ্ডিত দৃষ্টিতে ~~[illegible]~~ বিচার করে বলেছিলেন – তিনি পলায়নবাদী কবি, তিনি মানববিদ্বেষী, নির্জন তিনি নির্জনতম কবি, তিনি ক্লান্তির কবি, তিনি প্রকৃতির কবি, তিনি অন্ধকারের কবি – তাঁদের বিচারের সেই ভ্রান্তি বা ত্রুটিকে জীবনানন্দ নিজেই দূরীভূত করেছিলেন তাঁর কাব্যজগতের নিজস্ব মূল্যায়নে — আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা

Scanned with CamScanner

দেওয়া হয়েছে; কেউ বলেছেন, এ-কবিতা প্রাচীন প্রকৃতির বা প্রাচীন ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্যমতে নিসর্গচেতনার; কারো বিবেচনায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুররিয়ালিস্ট। আরো নানা রকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য — কোনো-কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো-কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।' (ভূমিকাংশ/ জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা)

১৯৪২ সালে কবিতা ভবন থেকে 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয় জীবনানন্দের তৃতীয় কাব্য 'বনলতা সেন' (প্রথম কাব্য- ঝরা পালক, দ্বিতীয়- ধূসর পাণ্ডুলিপি, চতুর্থ - মহাপৃথিবী, পঞ্চম- সাতটি তারার তিমির, ষষ্ঠ- জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা; সপ্তম- রূপসী বাংলা, অষ্টম- বেলা অবেলা কালবেলা - শেষ দুটি কাব্য কবির মৃত্যুর পর যথাক্রমে ১৯৫৭ ও ১৯৬১ সালে প্রকাশিত); এই সংকলনে মোট কবিতার সংখ্যা ছিল ১২ টি। প্রকাশক ছিলেন জীবনানন্দ দাশ, বরিশাল। পরে ১৯৫২ সালে এই গ্রন্থের ২-য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় সিগনেট প্রেস থেকে; প্রকাশক ছিলেন দিলীপ কুমার গুপ্ত, কলকাতা। মোট কবিতার সংখ্যা - ৩০ টি। এই সংস্করণের কবিতাগুলি হলো যথাক্রমে -
১. বনলতা সেন, ২. কুড়ি বছর পরে, ৩. ঘাস, ৪. হাওয়ার রাত, ৫. আমি যদি হতাম, ৬. হায় চিল, ৭. বুনো হাঁস, ৮. শঙ্খমালা, ৯. নগ্ন নির্জন হাত, ১০. শিকার, ১১. হরিণেরা, ১২. বিড়াল, ১৩. সুদর্শনা, ১৪. অন্ধকার, ১৫. কমলালেবু, ১৬. শ্যামলী, ১৭. দুজন, ১৮. অবশেষে, ১৯. স্বপ্নের ধ্বনিরা, ২০. আমাকে তুমি, ২১. তুমি, ২২. ধান কাটা হয়ে গেছে, ২৩. শিরীষের ডালপালা, ২৪. হাজার বছর শুধু খেলা করে, ২৫. সুরঞ্জনা, ২৬. মিতভাষণ, ২৭. সবিতা, ২৮. সুচেতনা, ২৯. অঘ্রান প্রান্তরে, ৩০. পথ হাঁটা।

আমরা সিগনেট প্রেস সংকলনকে অবলম্বন করেই আলোচনায় অগ্রসর হব।

প্রথমেই আলোচনা করা যেতে পারে জীবনানন্দের প্রেম চেতনা বিষয়ে — জীবনানন্দ প্রেমকে দেখেছেন বহুকৌণিক ভাবে - উল্টে পাল্টে। কখনো দেখেছেন শাশ্বতের অনুভবে, কখনো বা খণ্ডকালের অনুভবে। ভালোবেসে, ঘৃণা করে - নানা দিকের সমগ্রতায় তিনি নারীকে আস্বাদ করতে চান — 'ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে, / অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে, / ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;' (বোধ/ধূসর পাণ্ডুলিপি)

Scanned with CamScanner

'বনলতা সেন' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় কবি প্রেমকে এভাবে খণ্ড-অখণ্ড অনুভবের সমগ্রতায় অবলোকন করতে চেয়েছেন। যেমন কাব্যের নাম কবিতা বনলতা সেন (প্রথম প্রকাশ, পৌষ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, কবিতা পত্রিকা, সম্পা: বুদ্ধদেব বসু) – এ কবি প্রেমকে খণ্ড-অখণ্ড মিলিয়ে সমগ্রতায় অনুভব করেছেন। তাই যুগ যুগ (হাজার বছর) ধরে প্রেমের অন্বেষায় উদ্‌ভ্রান্ত পথ প্রান্ত যুগ-যন্ত্রণাক্লিষ্ট ক্লান্ত প্রাণ কবিসত্তাকে যেমন 'দু'দণ্ডের' (ক্ষণিকের) শান্তি দেয় বনলতা সেন, তেমনি আবার সমস্ত দিনের শেষে প্রকৃতির বুকে শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা নেমে আসার, অনুরূপে সমস্ত জীবের জীবন নীরবে মৃত্যু নেমে এলেও থেকে যায় শুধু গভীর শাশ্বত প্রেমের অনুভূতি – 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।' এই প্রেমকেই আবার 'হায় চিল' কবিতায় কবি দেখেছেন খণ্ডতার দৃষ্টিতে – 'তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে;/ পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;' প্রেমের খণ্ডিত, অপ্রাপনীয় রূপ দেখতে পাওয়া যায় 'সবিতা' কবিতায় – তোমার মুখের রেখা আজো/ মৃত কতো পৌত্তলিক খ্রীস্টান সিন্ধুর/ অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন;/ কতো কাছে – তবু কতো দূর।' 'সিন্ধুসারস' কবিতাতেও কবি সিন্ধুসারসের উদ্দেশ্যে ঝরে যাওয়া প্রেমের বিমর্ষতা তুলে ধরে বলেন – 'পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই – আর তার প্রেমিকের ম্লান / নিঃসঙ্গ মুখের রূপ, বিশুষ্ক তৃণের মতো প্রাণ,/ জানিবে না, কোনোদিন জানিবে না;' 'নগ্ন নির্জন হাত' – এ কবি এক প্রেমিক পুরুষের স্বীকারোক্তি – 'যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে/ অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি,/ সেই নারীর মতো/ ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠেছে।/ .../ তোমার মুখের রূপ কতো শত শতাব্দী আমি দেখি না,/ খুঁজি না।' শুধু মানব জীবনেই নয়, প্রকৃতির বুকেও প্রেমের এই খণ্ডতা, অনিশ্চয়তাকে কবি অনুভব করেছেন – 'সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে/ .../ সুন্দর বাদামী হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিলো/ .../ সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।/ একটা অদ্ভুত শব্দ।/ নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল।/ আগুন জ্বললো আবার – উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হয়ে এলো।' 'শঙ্খমালা' – তেও কবি প্রেমের স্বপ্ন অস্তিত্বের কথা বলেছেন – 'কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে/ সে কে এক নারী এসে ডাকিল আমারে, বলিল, তোমারে চাই; .../ .../ তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে।/ .../ কড়ির মতন শাদা মুখ তার,/ দুইখানা হাত তার হিম;/ চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম/ চিতা জ্বলে:/ দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়/ .../ এ-পৃথিবী একবার পায় তারে, পায়নাকো আর।' প্রেমের অনিশ্চয়তা দেখি 'ধান কাটা হয়ে গেছে' – তেও – 'ওইখানে একজন শুয়ে আছে – দিনরাত দেখা হতো কতো কতো দিন,/ হৃদয়ের খেলা নিয়ে তার কাছে করেছি যে

করে অপরাধ; / শান্তি তবু: গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং / আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।' আবার প্রেমকে জীবনানন্দ চিরন্তন শাশ্বত রূপে দেখেছেন 'সুরঞ্জনা'-তে — 'সুরঞ্জনা, আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছো; / পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন; /... / তুমি সেই অপরূপ সিন্ধু রাত্রি মৃতদের রোল / দেহ দিয়ে ভালোবেসে, তবু আজ ভোরের কল্লোল।' 'হাজার বছর শুধু খেলা করে'-তেও দেখি চারিদিকে মৃত সভ্যতা আর মৃত্যু আবহের মধ্যেও অটল অনন্ত রূপে জেগে থাকে প্রেম, প্রেমের অনুভূতি — "হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো: / চারিদিকে পিরামিড — কাফনের ঘ্রাণ; / শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের — ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন; / 'মনে আছে?' শুধালো সে — শুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন।'" একই ভাব 'হাওয়ার রাত' কবিতাতেও মৃত্যু আবহের মধ্যেই দেখি জীবনের, প্রেমের চিরন্তন বিজয় স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার — 'যে-রূপসীদের আমি এসিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি / কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানার কুয়াশায়-কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে করে / কাতারে-কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন — / মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য? / জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য? / প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য?' 'বনলতা সেন'-এর মতোই 'বুনো হাঁস'-এও দেখা যায় পৃথিবীর সব রূপ, রঙ ঝরে গেলেও অনন্ত রাত্রির বুকে জেগে থাকে শুধু শাশ্বত প্রেমের অনুভূতি — 'মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ; / উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক / কল্পনার হাঁস সব; পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং মুছে গেলে পর / উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।'

এই ভাবে আলোচ্য (পাঠ্য) কবিতাবলীতে দেখা যায় প্রেম চেতনার পাশাপাশি কবির বিশিষ্ট মৃত্যু এবং ইতিহাস ও ভূগোল চেতনাও অঙ্গাঙ্গী ভাবে সন্নিবিষ্ট রয়েছে।

বাস্তবিক কবি জীবনানন্দ বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজের নানা বিকার, অবক্ষয়, মূল্যবোধহীনতা, অসাম্য দেখে জীবন যন্ত্রণার প্রশমন ঘটাতে বারবার নিজের কবি মানসকে নিয়ে গেছেন ইতিহাসের বর্ণোজ্জ্বল পাতায়; প্রেম, প্রকৃতি আর মৃত্যুর আশ্রয়ে। এই আর এক

মহত্তর, মূল্যবোধে ভরপুর, স্থির প্রত্যয়ী পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষা করেন বলেই কবি সমসাময়িক যুদ্ধবিধ্বস্ত, মূল্যবোধহীন, অবক্ষয়িত, সংঘর্ষে ক্লান্ত ক্লিষ্ট পৃথিবী থেকে মুক্তি চেয়ে বলেন — 'কীর্তিনাশার নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকবো — ধীরে — পউষের রাতে — / কোনোদিন জাগবো না জেনে — / কোনোদিন জাগবো না আমি — কোনোদিন আর।' (অন্ধকার)

আবার পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্যের বিশেষ ধারার সুররিয়ালিজম, এক্সিস্টেনশিয়ালিজম, ইম্প্রেশনিজমের-ও প্রভাব দেখা যায় 'বনলতা সেন'-এর কয়েকটি কবিতায়। যেমন সুররিয়ালিজম বা পরাবাস্তববাদের প্রভাব দেখি — 'হাওয়ার রাত', 'বিড়াল' প্রভৃতি কবিতায়। স্বপ্নতত্ত্ব ব্যাখ্যা (Interpretation of dreems) করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনের তিনটি স্তরের (ইদ - ইগো - সুপার ইগো) কথা বলেছিলেন। মনের অন্তর্নিহিত (innate) স্তর হলো ইদ। এই স্তরেই অবস্থান করে মানবের লিবিডো তথা প্রবৃত্তিসমূহ। ইগো ইদ-কে নিয়মের শেকলে বেঁধে রাখে; আর সুপার ইগো তার উপর সামাজিক, রাষ্ট্রীয় অনুশাসন চাপিয়ে তাকে নীতিনিষ্ঠ, পরিশুদ্ধ করে তোলে। এর ফলে ইদ-এর স্বাভাবিক প্রকাশ ব্যাহত, অবদমিত হয় অধিসত্তা বা সুপার ইগোর স্তরে, আর এই অবদমনই কোনো কোনো ক্ষেত্রে জন্ম দেয় মানসিক বিশৃঙ্খলার — যা প্রাসঙ্গিক, সমাজ মানসের কাছে বিকার বা অপ্রকৃতিস্থতা বলে প্রতীয়মান হয়। সেই কারণেই কোনো কোনো ব্যক্তির আচরণে যেমন অসংলগ্নতা দেখা দেয় তেমনি স্বপ্নলোকেও নানা অসংলগ্ন, অসম্ভব, উদ্ভট দৃশ্যের যাওয়া-আসা চলে। ফ্রয়েডের এই তত্ত্বের নিরিখেই ইউরোপের চিত্র শিল্পকলা এবং সাহিত্যে দেখা দেয় ~~সুররিয়ালিজম~~ সুররিয়ালিস্টিক চিন্তা চেতনা। বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ হলেন এই ধারার পথিকৃৎ। তাঁর 'হাওয়ার রাত' কবিতায় স্বপ্নলোকের এরকম কিছু আপাত, অসম্ভব, অসংলগ্ন দৃশ্যের সন্ধান মেলে ① 'গভীর হাওয়ার রাত ছিলো কাল — …/ সারারাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে;/ মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো,/ কখনো বিছানা ছিঁড়ে/ নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে;/ এক-একবার মনে হচ্ছিলো আমার — আধো ঘুমের ভিতর হয়তো —/ মাথার উপরে মশারি নেই আমার,/ স্বাতিতারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো উড়ছে সে!'

② সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিলো — আকাশে এক তিল / ফাঁক ছিলো না;/ পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি;

③ যে-রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি/ কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানার কুয়াশায়-কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে করে/ কাতারে-কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন —

④ আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,/ নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে,/ একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায়-তারায় উড়িয়ে নিয়ে চললো/ একটা দুরন্ত শকুনের মতো।

অনুরূপ 'বিড়াল' কবিতায় — 'সারাদিন একটা বিড়ালের সঙ্গে ঘুরে-ফিরে কেবলই আমার দেখা হয়:/…/ সারাদিন সূর্যের পিছনে-পিছনে চলছে সে,/ একবার তাকে দেখা যায়,/ একবার হারিয়ে যায় কোথায়,/ হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে/ শাদা থাবা বুলিয়ে-বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে;/ তারপর অন্ধকারকে ছোটো-ছোটো বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনলো সে,/ সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিলো।'

Scanned with CamScanner

পাশ্চাত্যের আর এক সাহিত্য আন্দোলন—অস্তিত্ববাদী সাহিত্য আন্দোলন বা এক্‌জিস্টেনসিয়ালিজম। পাশ্চাত্য দর্শনে কিয়েরকেগার্ড যার প্রনেতা ছিলেন। তার পর পাশ্চাত্যের চিত্র শিল্প এবং সাহিত্যে এই দর্শনের প্রভাব পড়ে। অস্তিত্ববাদীরা বিশৃঙ্খল বিশ্বে একদা 'অমৃতস্য পুত্রা:' মানুষের অস্তিত্বকে দেখলেন অর্থহীন, শূন্য, তুচ্ছাতিতুচ্ছ কীটের তুল্য রূপে। এখানে উল্লেখ্য, তাঁদের বুলেটিনে (মুখপত্র)-এর নামই ছিল নসিয়া (nausea) অর্থাৎ বমনের ইচ্ছা। যুদ্ধ বিধ্বস্ত পৃথিবীতে ঈশ্বরও যাঁদের কাছে আর সত্য-শিব-সুন্দরের আধার নয়, তাঁরা তাই সামাজিক-রাষ্ট্রিক সকল অনুশাসন মুক্ত ব্যক্তির স্বাধীন একক (individual) অস্তিত্বের জয় ঘোষণা করেন। ফ্রানৎস কাফকা, আলবার্ট কামু-র হাতে বিশ্বযুদ্ধ কালীন সাহিত্যে (The Metamorphosis, Kafka, 1915; The Myth of sisyphus, Camus, 1942) অস্তিত্ববাদের সফল প্রয়োগ ঘটে।

অন্যদিকে ভ্যান গগ, এডভার্ড মুঙ্খ (Munch), পল সিজান (Cezanne)-এর হাতে চিত্রশিল্পের অস্তিত্ববাদের সফল প্রয়োগ ঘটে। সিজানের 'The card players' এবং মুঙ্খ-এর 'The Scream' (চিৎকার) বিখ্যাত অস্তিত্ববাদী চিত্র।

পাশ্চাত্যের ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীরা তাঁদের শিল্পকলায় বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছিলেন 'আলো'-কে। এই ধারার উল্লেখযোগ্য শিল্পী ছিলেন, ক্লদ মনে, এডওয়ার্ড মানে (Manet), অগাস্ট রেনোয়াঁ, পল সেজান প্রমুখ। ক্লদ মনে (Monet)-র আঁকা একটি বিখ্যাত ছবি ছিল 'The Water lily Pond' (পদ্মপুকুর)। দিনের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের আলোর তারতম্যে পদ্মপুকুরের রূপ কীভাবে বদলে যাচ্ছে—তাই ছিল এ ছবির বিষয়। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত ইম্প্রেশনিস্ট ছবি 'Sunrise' (সূর্যোদয়)। এডওয়ার্ড মানের বিখ্যাত ইম্প্রেশনিস্ট ছবি ছিল 'এক পানশালা' (A Bar at the Folies Berger)। জীবনানন্দের বেশ কিছু কবিতায় ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পের প্রভাব অনুভব করা যায়। যেমন—'বনলতা সেন' কাব্যের 'শিকার', 'ঘাস', 'সিন্ধু সারস', 'তোমাকে', 'আমাকে তুমি' প্রভৃতি কবিতা।

এছাড়া 'পাখির নীড়ের মতো চোখ...' (পাখির নীড়ে যে গভীর শান্তির আশ্রয় বনলতার চোখে সেই আশ্রয়ের আহ্বান); 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' (কালগত ব্যবধানে সুদূর অতীতের বিদিশা নগরী আজ যেমন অস্পষ্ট অন্ধকারে, তার প্রাচুর্য যেমন কল্পনার বিষয় বনলতার চুলের বর্ণ, গভীরতাও তাই); 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য' (বৌদ্ধ যুগ সেই যুগ, যে যুগের মূল ধর্মই ছিল শান্তি, মৈত্রী, ভালোবাসা; এই বৌদ্ধ যুগেই শ্রাবস্তী নগরী শিল্প-সৌকর্যে চরমোৎকর্ষ লাভ করেছিল। তাই বনলতার মুখশ্রীকে শ্রাবস্তীর শিল্প-কলার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—যার মধ্যে শুধু অপরূপ সুষমা নয়, ভালোবাসা,

Scanned with CamScanner

সান্নিধ্যেও নিহিত আছে।); 'হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা / ... দারুচিনি দ্বীপের ভিতর' (দারুচিনি-র যে সৌরভ, মিষ্টত্ব আছে, বনলতার প্রেমেও আছে সেরকম মিষ্টত্ব, সুরভি); 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে' (হৃদয়কে রক্তাক্ত, যন্ত্রণাদগ্ধ করে কেউ বিস্মৃত বেদনাকে পুনরুজ্জীবিত করতে চায় না); 'কড়ির মতন সাদা মুখ তার' (রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মৃত মুখ); 'দেহ তার বিবর্ণ পাখির রঙে ভরা' (যুদ্ধক্লিষ্ট অবক্ষয়িত অসুস্থ সময়ে হেমন্তের গভীর গভীরতর অসুখে দেহ লাবণ্যহীন, বিবর্ণ, খসখসে); 'নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল' (শিকারীর গুলিতে নিহত হরিণের চাপ চাপ রক্তে নদীর জল স্তরে স্তরে লাল) – অনুরূপ ইমেজ বা চিত্রকল্পের (চিত্রের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা যার মধ্যে নিহিত থাকে) মুহুর্মুহু সাক্ষাৎ মেলে জীবনানন্দের কবিতাবলীতে।

আবার ফভিস্ট চিত্রশিল্পীদের মতো চড়া হলুদ রঙের বহুল ব্যবহারও জীবনানন্দের কবিতায় পাওয়া যায়। এছাড়াও যুদ্ধবিধ্বস্ত, অসুস্থ, বন্ধ্যা পৃথিবী এবং জীবনের নৈরাশ্য, অবক্ষয়িত মৃত-রূপকে তুলে ধরতে তিনি অন্ধকার, ধূসর, বিমর্ষ, বিবর্ণ – এই চিত্রকল্পগুলি বারংবার ব্যবহার করেছেন।

ইংরেজ কবি কিটস-এর মতো জীবনানন্দও ছিলেন অত্যন্ত sensuous বা ইন্দ্রিয়ঘন কবি। এক ইন্দ্রিয় দিয়ে তিনি আরেক ইন্দ্রিয়ের অনুভব পান। যেমন – ১ ভোরের রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল। ২ এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো / গেলাসে-গেলাসে পান করি। ৩ হলুদ পাতার গন্ধে ভরে ওঠে অবিচল শালিখের মন। ৪ পৃথিবীর নরম অঘ্রাণ। ৫ রৌদ্রের আঘ্রাণে। ৬ পেয়েছে ঘাসের ঘ্রাণ। ৭ সূর্যের নরম শরীরে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১ বনলতা সেন : জীবনানন্দ দাশ : সিগনেট প্রেস / ভারবি প্রকাশন, কলকাতা
২ জীবনানন্দ : গোপালচন্দ্র রায় : সুবর্ণরেখা, কলকাতা
৩ একটি নক্ষত্র আসে : অম্বুজ বসু, কলকাতা
৪ আমার কালের কয়েকজন কবি : জগদীশ ভট্টাচার্য
৫ কবি জীবনানন্দ, অনুভবে, অনুধ্যানে : তরুণ মুখোপাধ্যায় : বামা পুস্তকালয়, কলকাতা
৬ সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ : কুন্তল চট্টোপাধ্যায় ; রত্নাবলী, কলকাতা

** ১ নং দলের টেক্সট বইটি – এর সাথে ফলো করে পড়বে।